ন্যায্য অর্থ না হোক, মর্যাদাটা যেন পায় শ্রমিকরা

প্রভাষ আমিন

বাংলাদেশের অর্থনীতি, অগ্রগতি, সম্ভাবনা সবকিছু দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজি 'R' আদ্যাক্ষরের তিনটি শব্দের উপর– Rice, Remittance, RMG. সোজা বাংলায় কৃষকের উৎপাদিত ধান, প্রবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্স আর তৈরি পোশাক রপ্তানি– এই তিন হলো বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। এই তিনটিই শ্রমঘন কাজ। সরলভাবে বললে, বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতার অবদান সামান্যই। বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে আসলে শ্রমিকের ঘামে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমে। আসলে বাংলাদেশে সবচেয়ে সহজলভ্য হলো মানুষ, তাই সবচেয়ে সস্তা হলো শ্রম।

কিন্তু যে শ্রমিকরা আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে, দেশকে এগিয়ে নিচ্ছে সেই শ্রমিকরাই বাংলাদেশে সবচেয়ে অবহেলিত। কৃষকের কথাই ধরুন, সারাবছর অবর্ণনীয় পরিশ্রমে তারা ফসল ফলায়, আমাদের আহার জোগায়। কিন্তু তাদের কোনো ভয়েস নেই, কোনো সংগঠন নেই, গণমাধ্যমে তারা উপেক্ষিত, রাজনীতিবিদদের কাছে তারা অবহেলিত। সেচের পানি না পেয়ে কৃষকদের আত্মহত্যা করতে হয়। মূলধারার গণমাধ্যমের সংবাদে ঠাঁই পেতে তাদের হয় মরতে হয়, নয় তাদের বাঁধ ভাঙতে হয়, নয় বন্যায় ভেসে যেতে হয়, নয় নদী ভাঙতে হয়। তারা পণ্যের ন্যায্যমূল্য পান না। সরকারের নানা সাহায্য তাদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছায় না। একেবারে ভেসে যাওয়ার আগে আমরা তাদের নিয়ে একটু আহা-উহু করি বটে, কিন্তু তাতে তাদের কোনো লাভ হয় না। প্রত্যেকবার ভরা মৌসুমে ধান, পাট, আলু, পেঁয়াজ, সবজির দাম এতটা কমে যায়; কৃষকের খরচের টাকাই ওঠে না, শ্রমের দাম তো অনেক পরে।

আমি প্রতিবার ভয় পাই, এইবার কৃষক যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, আগামীবার হয়তো এই কৃষক আর ফসলই ফলাতে পারবে না। কিন্তু আমাদের অদম্য কৃষকদের কখনো ধ্বংস করা যায় না। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস-বন্যায় সবকিছু ভেসে গেলেও তারা মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন। সরকারি সাহায্যের আশায় থাকেন না তারা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মানিয়ে নিয়ে টিকে থাকার এক অনন্য শক্তি আছে তাদের। সেই শক্তির বলেই তারা ধ্বংস হতে হতে আবার উঠে দাঁড়ান। আবার ফসল ফলান এই ব-দ্বীপের উর্বর মাটিতে। কৃষকরা যদি সংগঠিত হতেন, তাহলে পদ্মা সেতুতে রেল চালু না করে, হাওর এলাকায় টেকসই বাঁধ নির্মাণ করা হতো। হাওরে টেকসই বাঁধের যে রিটার্ন পদ্মা সেতুর রেল দিয়ে তা আসবে না। কৃষকের লাভক্ষতি তারা বলতে পারেন না, তাদের কান্না আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। তবুও কৃষক কারো দিকে না তাকিয়ে কাজ করে যায়। কৃষকের কথা তবু আমরা কিছুটা জানি, শুনি, বলি; কিষানীদের কথা কোথাও লেখা থাকে না। কৃষকের পাশাপাশি তাদের ঘরের নারীরাও সমান তালে হাত লাগান। গ্রামের নারীদের এই অবদানের কথা জিডিপিতে থাকে না, উন্নয়নে থাকে না, গড় আয়ে থাকে না।

বাংলাদেশের উন্নয়নের আরেক নিঃস্বার্থ যোদ্ধা প্রবাসী শ্রমিকরা। বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ দেশের বাইরে থাকেন। তাদের সবাই রেমিটেন্স যোদ্ধা নন। আমাদের মতো শিক্ষিতরা যারা নানা কারণে, নানা কৌশলে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় থিতু হন; তারা রেমিটেন্স তো পাঠানই না; উল্টো দেশে থাকা সব সম্পত্তি বিক্রি করা টাকা পাচার করে নিয়ে যান নিজের 'স্বপ্নের দেশে'। সেখানেই বাড়ি কেনেন, গাড়ি কেনেন, ভবিষ্যদের জীবন গড়েন। কালেভদ্রে তারা দেশে আসেন বেড়াতে। কিন্তু দেশের সাথে তাদের যোগাযোগ ঐটুকুই। কিন্তু দেশে এলে তাদের ঠাঁটবাটই আলাদা। বিমানবন্দরে তাদের আলাদা সম্মান। এলাকায় সংবর্ধনা, ঢাকায় পার্টি-বেড়ানোর দিনগুলি উড়ে যায়। তারা টাকা পাঠান না, দেশ থেকে টানা নেন।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তো বটেই বিশ্বের অধিকাংশ দেশে ছড়িয়ে থাকা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধারা অকল্পনীয় কষ্টে অর্থ উপার্জন করেন। নিজেরা খেয়ে না খেয়ে থেকে উপার্জনের প্রায় পুরোটাই দেশে পাঠিয়ে দেন। দেশে বাবা-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তানের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদে। কিন্তু খরচের ভয়ে দেশে ফিরতে পারেন না। অনেকে একেবারে দেশে ফেরেন, অনেকে ফেরেন লাশ হয়ে। অনেকে ২/৩ বছর পর ফেরেন অনেক আশা নিয়ে, অনেক স্বপ্ন নিয়ে। বিমানবন্দরে তাদের সাথে যে আচরণ করা হয়, আমি যতবার দেখেছি, লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে যায়। যারা দেশ থেকে টাকা পাচার করে বিমানবন্দরে ভিআইপি মর্যাদা পায়। আর যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশে টাকা পাঠায় তাদের সাথে কুকুর-বেড়ালের মতো আচরণ করা হয়। গ্রামে ফিরে দেখেন, তার পাঠানো টাকায় ভাইয়ের বাড়িতে দালান উঠেছে, অনেকে ফিরে দেখেন স্ত্রী অন্যের হাত ধরে পালিয়েছে। তারা দেশের জন্য এতকিছু করেন, কিন্তু সামান্য মর্যাদাও পান না।

কৃষকের শ্রমটা আবহমান কালের। ওটা তাই আমাদের চোখে সয়ে গেছে। মনে হয়, কৃষকের কাজই তো ফসল ফলানো। স্বাধীনতার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের শ্রমিকদের ছড়িয়ে পড়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে দারুণ চাঞ্চল্য এনেছে। একজনের বিদেশে যাওয়া মানেই একটি পরিবারের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বদলে যাওয়া। তবে প্রবাসী শ্রমিকদের কাজটা আমরা চোখে দেখি না। তবে আমাদের চোখের সামনে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বদলে দিয়েছে গার্মেন্টস মানে তৈরি পোশাক খাত। নারীর ক্ষমতায়নেও গার্মেন্টস খাতের ভূমিকা বিশাল। বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশের মূল কারণ সস্তা শ্রম। এই ব্যাপারে বাংলাদেশের কোনো প্রতিযোগী নেই। কিন্তু সেই সস্তা শ্রমটার মূল্যও আমাদের গার্মেন্টস মালিকরা ঠিকমত দিতে চান না। বাংলাদেশে এক প্রজন্মে বড়লোক হওয়া শ্রেণি হলো গার্মেন্টস মালিকরা। নিজেরা বছর বছর গাড়ির মডেল বদলান। সরকারের কাছ থেকে নানা সুযোগ সুবিধা নেন, কিন্তু গামেন্টস শ্রমিকদের ভাগ্য বদলায় না। বাংলাদেশে মানুষ যেমন বেশি, শ্রম যেমন সস্তা, মানুষের জীবনও সস্তা। একসময় বাংলাদেশে গার্মেন্টস খাতে দুর্ঘটনা লেগেই ছিল। ২০১৩ সালে রানা প্লাজায় ধ্বসের ঘটনা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের জন্য শাপে বর হয়েছে। ১ হাজার ১৭৫ জন মানুষের জীবনের বিনিময়ে অনেকটাই ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে গার্মেন্টস শিল্প। ঝুঁকি কমলেও আয় বাড়েনি খুব একটা। প্রতিবছর ঈদের আগে বেতন-বোনাসের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আন্দোলনের খবর পাই। মালিকরা সময়মত বেতন-বোনাস-ওভারটাইমের টাকা পরিশোধ করেন না।

মানুষের শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে যে দেশের অর্থনীতি, সে দেশে শ্রমিকরাই ভিআইপি মর্যাদা পাওয়ার কথা। কিন্তু বাংলাদেশে পদে পদে শ্রমিকরা অবহেলা আর উপেক্ষার শিকার। এই বাস্তবতায় বিশ্বের আরো অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও মে দিবস পালিত হয়। ১৮৮৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের সামনে দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকদের আন্দোলন এবং আত্মাহুতির ঘটনার মানুষ স্মরণ করে বিশ্বজুড়ে। মে দিবস পালিত হয় বাংলাদেশেও। কিন্তু একদিনের সরকারি ছুটি ছাড়া বাংলাদেশের শ্রমিকরা আর কিছু পায় না। বরং একদিন ছুটি থাকলে দিনমজুরদের আয় একদিন কম হয়।

এই যে আমাদের শ্রমনির্ভর অর্থনীতি। সেই দেশের শ্রমের দাম যেমন কম, মর্যাদাও কম। দামের ক্ষেত্রে না হয়, আপনি বলতে পারেন, না পোষালে কাজ করবেন না। কিন্তু শ্রমিকদের একটু সম্মান, একটু মর্যাদা দিতে তো আর টানা লাগে না; মানসিকতা বদলালেই হয়। বাংলাদেশে শ্রমিক মানেই অবহেলিত, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত। আর শ্রমের মর্যাদা নেই বলেই বাংলাদেশের মানুষ বিদেশে গিয়ে যেই পরিশ্রম করে, দেশে সেটা করতে চায় না। বিদেশে রাবার বাগানে অমানুষিক পরিশ্রম করা বা উন্নত বিশ্বে হোটেলে বাসন মাজার কাজ করা লোকটিও দেশে ফিরে বাবুগিরি করেন। লন্ডনে হোটেলে কাজ করা লোকটি বাংলাদেশে কখনোই হোটেলে কাজ করবেন না। নিউ ইয়র্কের ট্যাক্সি চালানো যুবকও বাংলাদেশে বিয়ের বাজারে ভালো পাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের উবার চালকের কাছে আমরা মেয়ে বিয়ে দিতে চাই না। যেহেতু শ্রমিকরাই আমাদের অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে, এগিয়ে নিচ্ছে; তাই তাদের সর্বোচ্চ মর্যাদা দিতে হবে, বদলাতে হবে আমাদের মানসিকতা।